সমকাল

14 JUN 2025

# কমপ্লায়েন্সের অভাবে ধুঁকছে চামড়া খাতের রপ্তানি

■ জসিম উদ্দিন বাদল

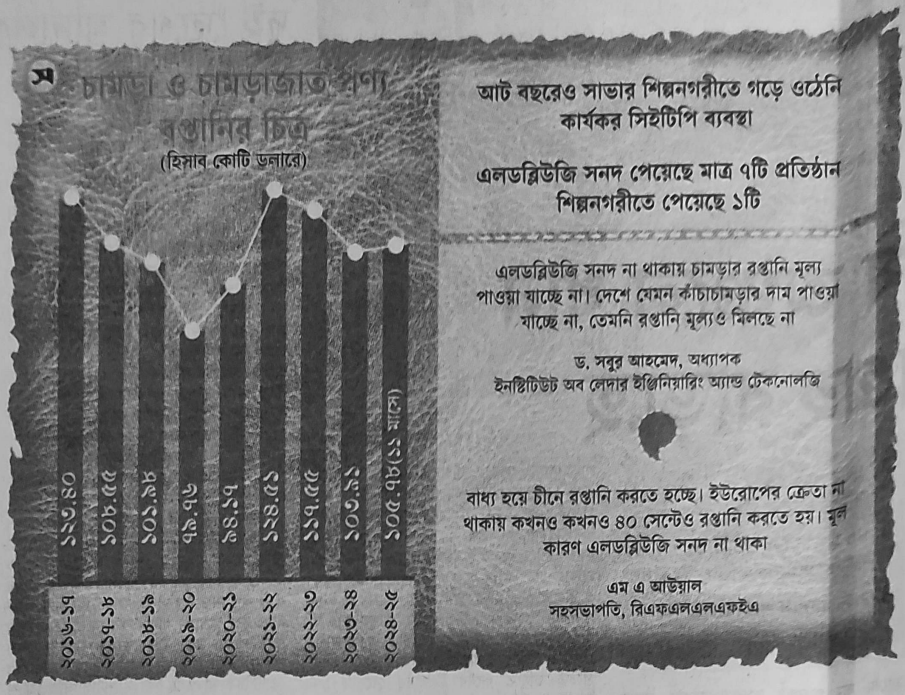


চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত। পণ্য উৎপাদনের প্রধান কাঁচামালের শতভাগ জোগান থাকা সত্ত্বেও রপ্তানিতে এ খাতে তেমন অগ্রগতি নেই। এ খাতে কমপ্লায়েন্স বা যথাযথ মান প্রতিপালনের অভাবে ধরা যাচ্ছে না বৈশ্বিক বাজার। বাধ্য হয়ে পানির দরে চীনে রপ্তানি করতে হচ্ছে। এ কারণে কোরবানির পশুর কাঁচাচামড়ার দামও পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞ ও খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, আন্তর্জাতিক সংস্থা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ না থাকায় বিদেশি ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশ থেকে চামড়া নিতে নিরুৎসাহিত হন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিশোধন ব্যবস্থায় ঘাটতি থাকার কারণে এই সনদ পাচ্ছে না ট্যানারি প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে ব্যাপক সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববাজারে জায়গা করে নিতে পারছে না বাংলাদেশের চামড়াশিল্প। এতে একদিকে যেমন দাম না পাওয়ায় প্রতিবছর কোরবানির পশুর চামড়া নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে চামড়াপণ্য রপ্তানির জন্য বছরে অন্তত এক বিলিয়ন ডলারের চামড়া আমদানি করতে হচ্ছে। তারা বলছেন, সরকার কিছু অর্থ ব্যয় করে সাভারের ট্যানারিপল্লিকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তা বিশ্বে মডেল হিসেবে দাঁড়াবে। এতে বাংলাদেশ যেমন ব্র্যান্ডিং হবে তেমনি রপ্তানিও বাড়বে। একই সঙ্গে বাড়বে পণ্যের দাম। তা ছাড়া পরিবেশবান্ধব ট্যানারি গড়ে তুলতে না পারায় বিদেশি বিনিয়োগ টানতেও বাংলাদেশ ব্যর্থ হচ্ছে বলে মনে করেন তারা।

**রপ্তানির চিত্র**

একসময় পাট, চা ও চামড়া ছিল অন্যতম রপ্তানি খাত। রপ্তানিতে পাট ও চা অনেক আগেই সেই জৌলুস হারিয়েছে। এখন চামড়া খাতও অনেকটা সেই পথে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০২০ সালের দিকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ বছরে ১০ থেকে ১২ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু রপ্তানির চিত্র বলছে, সেই পথ এখনও বহু দূর। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয় করে ১২৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে কমছে রপ্তানি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০৮ কোটি ৫৫ লাখ ডলার ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০১ কোটি ৯৮ লাখ ডলারের রপ্তানি হয়েছে। তবে করোনা অতিমারির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানিতে বড় ধস নামে। ওই বছর মাত্র ৭৯ কোটি ৭৬ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়। এরপর কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায় রপ্তানি। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৪ কোটি ১৭ লাখ ডলারের রপ্তানি হলেও পরের ২০২১-২২ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়ায় ১২৪ কোটি ৫১ লাখ ডলারের। তবে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফের কমে যায়। এই দুই বছরে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে যথাক্রমে ১১৭ কোটি ৫৫ লাখ ডলার ও ১০৩ কোটি ৯১ লাখ ডলার। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১ মাসে রপ্তানি আয় এসেছে ১০৫ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। একসময় ইউরোপের দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে চামড়া নিত। প্রতি বর্গফুট চামড়ার দর ছিল অন্তত এক ডলার। কমপ্লায়েন্সের অভাব থাকায় এখন ইউরোপের ক্রেতারা নিচ্ছে না। ফলে এক রকম বাধ্য হয়ে চীনে রপ্তানি করতে হচ্ছে পানির দরে। রপ্তানিকারকরা জানান, দাম কমতে কমতে এখন ৫০ থেকে ৬০ সেন্টে নেমেছে। মূলত আন্তর্জাতিক মান সংস্থা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ না থাকায় রপ্তানি বাজার ধুঁকছে।

**কোরবানির পশুর চামড়ার দাম কেমন**

দেশে ২০১৩ সালের কোরবানির গরুর চামড়ার দাম ছিল বর্গফুটপ্রতি ৮৫-৯০ টাকা। এরপর থেকে দাম কমতে থাকে। বড় ধস নামে ২০১৯ সালে। তখন ন্যূনতম দাম না পেয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চামড়া নদী-নালায় ও সড়কে ফেলে ও মাটিতে পুঁতে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফলে নষ্ট হয় শত শত কোটি টাকার চামড়া। এরপর আরও কমছে দাম। এ বছর ঢাকায় কোরবানির গরুর কাঁচাচামড়া ৬৫০ থেকে ৮০০ টাকায় চামড়া বিক্রি হলেও ঢাকার বাইরে ছিল হতাশার ছাপ। গ্রামগঞ্জে প্রতিটি চামড়া বেচাকেনা হয়েছে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায়। ছাগলের চামড়ার ক্রেতা খুঁজেও পাওয়া যায়নি।

**পরিবেশবান্ধব হতে ট্যানারিপল্লি কতটা প্রস্তুত**

পরিবেশদূষণ রোধে ২০০৩ সালে সাভারের হেমায়েতপুরে চামড়াশিল্প নগর স্থাপনের কাজ শুরু হয়। যেখানে ব্যয় ধরা হয় প্রায় ১১শ কোটি টাকা। প্রায় ২২ বছর অতিবাহিত হলেও এটি এখনও পুরোপুরি কার্যকরী শিল্পনগরী হয়ে ওঠেনি। কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয় ২০১২ সালে। সেটি নির্মাণের পর পুরোপুরি চালু না করেই ২০১৭ সালে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তর করা হয় হেমায়েতপুরে। এখনও কাঁচাচামড়া প্রক্রিয়াজাত করার ফলে সৃষ্ট তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, লবণ বিশুদ্ধকরণ ব্যবস্থা এবং সাধারণ ক্রোমিয়াম পুনরুদ্ধার ইউনিট স্থাপনে তেমন অগ্রগতি হয়নি সেখানে। সাভারে স্থানান্তরিত ট্যানারি মালিকরা জানান, সিইটিপির তরল বর্জ্য পরিশোধনের সক্ষমতা দৈনিক ২৫ থেকে ৩০ হাজার ঘনমিটার। কোরবানির পর ট্যানারিগুলো পুরোদমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত শুরু করলে তখন ৪০ থেকে ৪৫ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য উৎপাদন হয়, যা সিইটিপির সক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি।

**এলডব্লিউজি সনদ পেতে বাধা কোথায়**

বিসিক ও বিডার এক গবেষণায় দেখা গেছে, এলডব্লিউজি পেতে হলে চামড়াশিল্পের পরিবেশগত মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ১৭টি বিষয়ে ১ হাজার ৭১০ নম্বর পেতে হয়। যার মধ্যে ৩০০ নম্বর রয়েছে সিইটিপিসংক্রান্ত। বাকি ১ হাজার ৪১০ নম্বর রয়েছে জ্বালানি খরচ, পানির ব্যবহার, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, চামড়ার উৎস শনাক্তকরণ, দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার মান ইত্যাদি বিষয়। এসব মানদণ্ড পূরণের দায়িত্ব ট্যানারি মালিকদের।

জানা গেছে, বর্তমানে ১৫ থেকে ২০টি ট্যানারির এলডব্লিউজি সনদের শর্ত পূরণ করার সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তারা অন্যান্য মানদণ্ডে ভালো নম্বর পেলেও সিইটিপিসংক্রান্ত নম্বরে পিছিয়ে রয়েছে, ফলে সনদও মিলছে না। কারণ তরল বর্জ্য, রাসায়নিক ঠিকমতো পরিশোধন হচ্ছে না, যা দূষিত করছে আশপাশের নদী ও পরিবেশ।

এখন পর্যন্ত এলডব্লিউজি সনদ পেয়েছে মাত্র সাতটি প্রতিষ্ঠান। সেগুলো হচ্ছে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার, রিফ লেদার, এবিসি লেদার, সুপারেক্স লেদার, সাফ লেদার, সিমোনা ট্যানিং এবং অস্টান লিমিটেড। এগুলোর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান ফিনিশড লেদার উৎপাদন করে। তবে সাভারের ট্যানারি পল্লিতে এই সনদ পেয়েছে একমাত্র সিমোনা ট্যানিং। প্রতিষ্ঠানটি ক্রাস্ট ও ফিনিশড লেদার উৎপাদন করে।

**কী বলছেন ট্যানারি মালিক ও রপ্তানিকারকরা**

বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএলএলএফইএ) সহসভাপতি ও ভুলুয়া ট্যানারির চেয়ারম্যান এম এ আউয়াল সমকালকে বলেন, একসময় চীনে রপ্তানির আগ্রহ ছিল না রপ্তানিকারকদের। এখন বাধ্য হয়ে চীনকে দিতে হচ্ছে। প্রতি বর্গফুট চামড়া রপ্তানি করতে হচ্ছে এক ডলারে। ইউরোপের ক্রেতা না থাকায় কখনও কখনও ৪০ সেন্টেও রপ্তানি করতে হয়। এর মূল কারণ এলডব্লিউজি সনদ না থাকা।

তিনি বলেন, ২০১৭ সালে ট্যানারিগুলোকে সরকার বাধ্য করেছিল সাভারের ট্যানারি পল্লিতে যেতে। সেখানে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশবান্ধব ট্যানারি গড়ে তোলা। পরিপূর্ণ কমপ্লায়েন্স হওয়া। যাতে চামড়ার ভালো দাম পাওয়া যায়। সেই আশা বিফলে গেছে। সাভারে সরকার পরিপূর্ণ সিইটিপি গড়ে তুলতে পারেনি।

জুতা উৎপাদনকারীরা জানান, জুতা তৈরি করার জন্য মাসে ১২ থেকে ১৫ লাখ বর্গফুটের মতো চামড়া আমদানি করতে হয় বাংলাদেশকে। ফলে চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য রপ্তানি করে যে পরিমাণ আয় হয়, তা চলে যায় আমদানিতে। বেঙ্গল লেদার কমপ্লেক্সের মালিক ও বিএফএলএলএফইএর উপদেষ্টা টিপু সুলতান বলেন, চামড়ার রপ্তানি মূল্যের চেয়ে আমদানি মূল্য কয়েক গুণ বেশি। একসময় প্রতি বর্গফুট চামড়া রপ্তানি হতো কমপক্ষে এক ডলারে। এখন ৫০ থেকে ৬০ সেন্টের বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রতি বর্গফুট চামড়া আমদানি করতে হয় দুই থেকে আড়াই ডলারে। তবে আমদানি করা চামড়া উন্নত মানের। সালমা ট্যানারির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) সিনিয়র সহসভাপতি সাখাওয়াত উল্লাহ বলেন, বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও ট্যানারিপল্লিকে কমপ্লায়েন্স করতে পারেনি সরকার। এ কারণে এলডব্লিউজি সনদ মিলছে না। রপ্তানির সম্ভাবনাকেও কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

**বিশেষজ্ঞ মত**

এলডব্লিউজি সনদ না থাকায় চামড়ার রপ্তানি মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না বলে মনে করেন ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক ড. সবুর আহমেদ। তিনি বলেন, দেশে যেমন কাঁচাচামড়ার দাম পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি ফিনিশড লেদার বা প্রক্রিয়াজাত চামড়ারও রপ্তানি মূল্য মিলছে না। বাধ্য হয়ে পানির দরে রপ্তানি করতে হচ্ছে। সে জন্য সিইটিপি কার্যকর করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। ড. সবুর আহমেদ বলেন, যেহেতু রপ্তানি মূল্য কম সে ক্ষেত্রে চামড়া দিয়ে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য উৎপাদন করে তা রপ্তানি করা যায়। তাতে কর্মসংস্থানও বাড়বে।

CamScanner